International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/44
VOLUME: VIII, ISSUE: 1 || MARCH, 2026 || pp 1-9



International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

Tarashankar Bandyopadhyayer 'Aranya-Banhi': Prosongo Adibashi Kotha

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' : প্রসঙ্গ আদিবাসী কথা

সুমন্ত দাস
Ph. D গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, Email: sumantadas133@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History
Received: 11.02.2026
Revised: 05.03.2026
Accepted: 10.03.2026
Published: 31.03.2026

Keywords
Sidhu,
Kanu,
Manki,
Ful,
Tuski,
Kenaram Bhakat,
Mahendra Bhakat,
Mahesh Daroga,
The Santhal Rebellion

ABSTRACT

Tarashankar Bandyopadhyay (1899–1971) was the literary voice of the lateritic soil of the Rarh region of Bengal. In his novel 'Aranya-Bahni' (1966), the narrative of the marginalized Santhal indigenous community emerges in manifold ways. Ancient India had long remained fragmented by the divisions of the Varnashrama (caste system); subsequently, wave after wave of foreign invaders arrived, ceaselessly exploiting the land. It was not the case that the populace spontaneously united to repel these foreign aggressions; rather, mainstream Indian society remained fractured across social, economic, and political dimensions. Meanwhile, deep within the very heart of India—sustaining a distinct "India of their own" and remaining detached from the mainstream currents of civilization—the Santhal indigenous people managed to preserve their existence. When subjected to pressure to convert to Christianity, constantly defrauded by moneylenders, and witnessing the dignity of their

CC BY NC

womenfolk violated at the hands of British colonial masters, they were left with no recourse but to take up their primal weapon: war. To reclaim their lost rights, they stood—bows in hand—against a formidable array of muskets, rifles, and cannons. Fully aware that defeat was inevitable in such an unequal conflict, they nevertheless marched forward in rebellion. History thus bore witness to this stark, black-and-white chapter unfolding against the backdrop of a vibrant world. It is the intention of the present critic to highlight the story of these indigenous people as portrayed within the novel under discussion, 'Aranya-Bahni'.

১.০ ভূমিকা (Introduction)

রাঢ় বাংলার কাঁকুরে মাটির সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর 'অরণ্য-বহ্নি' (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসের মধ্যে নিম্নবর্গের সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা উঠে এসেছে নানাভাবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রমের ভাগাভাগিতে নিজেদের ভাগ করেই রেখেছিল, পরবর্তীতে একের পর এক জাতি এসেছে আর শোষণ করে গেছে এই দেশকে। বৈদেশিক আক্রমণকে আটকাতে জনগন যে চটজলদি সমষ্টিবদ্ধ হয়েছে, এমনটা না। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এই ত্রিবিধ মাপকাঠিতে আলাদা হয়ে ছিল ভারতের মূল সমাজ। অন্যদিকে ভারতবর্ষের বুকেই আরেকটা নিজেদের ভারতবর্ষ নিয়ে, সভ্যতার মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জিইয়ে রেখেছিল সাঁওতাল আদিবাসীরা। তাদের উপর যখন খ্রিষ্টান হওয়ার চাপ আসে, প্রতিনিয়ত ঠকতে হয় মহাজনদের কাছে, ইংরেজ সাহেবদের হাতে তাদের স্ত্রী জাতির সম্মান লুণ্ঠিত হয়; তখন তাদের নিরুপায় হয়ে তুলে নিতে হয় আদিম অস্ত্র– যুদ্ধ। নিজেদের হৃত অধিকার ফিরে পেতে তারা ধনুক হাতে দাঁড়ায় গোলা-বন্দুক-কামানের সামনে। অসম এই যুদ্ধের ফলাফলে হার নিশ্চিত জেনেও তারা পা বাড়ায় বিদ্রোহে। রঙিন পৃথিবীর বুকে এমন সাদা-কালো অধ্যায়ের সাক্ষী হয় ইতিহাস। আমাদের আলোচ্য 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যে এই আদিবাসীদের কথা তুলে ধরায় বর্তমান সমালোচকের অভিপ্রায়।

২.০ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী (Research Questions)

পরাধীন ভারতে ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে কয়েকটি বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিদ্রোহ হল সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ইতিহাসের ছায়া থেকে উপন্যাসের কায়া কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার অণুপুঙ্ক্ষ দস্তাবেজ এবং আদিবাসী জীবনের নানান প্রতিকূলতা ও তা থেকে সৃষ্ট বিদ্রোহের রূপ ও ফলাফলের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ কতখানি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ,তা'ই বর্তমান গবেষণা কর্মটির অন্যতম প্রধান প্রশ্ন।

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

গবেষণাটি মূলত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে সুসম্পন্ন করা হবে। এজন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বই-পত্রের ব্যবহার একান্তভাবে প্রয়োজন। বিশেষ করে এই উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে রচিত বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা মূলক বই ভীষণভাবে জরুরি। উপন্যাসটির বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিকতার দলিল হল এই সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলি। এর পাশাপাশি ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট থেকে পাওয়া নিখুঁত তথ্য ও তত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ গবেষণাকর্মটিকে পূর্ণাঙ্গ মাত্রা প্রদানে সহায়ক হবে। গবেষণার সহায়তার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪.০ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Data Collection and Analysis)

আকর গ্রন্থ হিসেবে মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত তারাশঙ্কর রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ড গ্রন্থটি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঔপন্যাসিক কর্তৃক উপন্যাসের মতামত জানতে তারাশঙ্কর রচনাবলীর একবিংশ খণ্ডেরও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যের বিশ্লেষণে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থ ও ইন্টারনেটের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে গবেষককে। গবেষণা পত্রটির শেষে উপস্থিত তথ্যসূত্র এবং সহায়ক গ্রন্থ, আসলে কোন কোন বই পত্রের প্রতি গবেষক কৃতজ্ঞ তারই পরিচায়ক। পরবর্তী অংশে গবেষণা কর্মটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.০ ফলাফল ও ব্যাখ্যা (Result and Discussion)

বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন পরিস্ফুটিত হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সেখানে স্থান করে নেয় গণমানুষের জীবন। ঔপনিবেশিক শক্তি অর্থাৎ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর প্রান্তিক ও দলিত গোষ্ঠীর দ্রোহ-চেতনা, নিষ্পেষিত জীবন ও তার স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি বাংলা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে একে একে ফ্রয়েডের তত্ত্ব, মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম, রণজিৎ গুহের সাব-অল্টার্নের ধারণা ইত্যাদির চর্চা পাঠক ও বুদ্ধিজীবিদের তাত্ত্বিক জগতকে নতুন করে আবিষ্কারের পথে এনে দাঁড় করায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ), এই নতুন সময়ের কথাকার। নিজের লেখনী শক্তির বলে তিনি হয়ে উঠেছেন 'রাঢ় বঙ্গের মহান কথাকার' কিংবা 'বাংলা সাহিত্যের চতুর্থ সম্রাট'। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম লালমাটির দেশ বীরভূমের ক্ষীয়মান সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার এক ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারে। বীরভূম এমনিতেই শাক্ত-বৈষ্ণব-আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশের মিলন ক্ষেত্র। এখানে কারোর সঙ্গে কারোর দ্বন্দ্ব নেই; আছে পরম আত্মীয়ের মতো সম্মিলন। কিন্তু কালের সন্ধিলগ্নে, মহাকালের ভাঙা গড়ার মরশুমে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার জমিদারিতে ঘুণ ধরেছে, পাশাপাশি শুরু হয়েছে শিল্প ও বস্তু জগতের লড়াই। এই লড়াইয়ের সময়কালে নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অমরত্ব পেয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সৃষ্টির মূল অবলম্বন হল মানুষ, সমাজ, সমকালের রাজনীতি এবং সমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ও সামাজিক শ্রেণির শত্রুতা।

ইতিহাস একটি সতত সচল প্রক্রিয়া। অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে তার এক রৈখিক সম্প্রসারণ। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কাজ ইতিহাসের কাহিনি পরম্পরার বয়ান লেখা নয় বরং ঐতিহাসিক রসকে অক্ষুন্ন রেখে মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে বিস্মৃত বিবর্ণ যুগকে প্রাণবান করে তোলায় তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আমাদের আলোচ্য 'অরণ্য-বহ্নি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অরণ্যচারী অধিবাসী আদিবাসীদের সরল জীবন যাত্রা কীভাবে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী ও তার প্রতিভূ স্বরূপ বাঙালি

জোতদারদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা ই উঠে এসেছে এই উপন্যাসটিতে। 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসটি সাঁওতাল বিদ্রোহের মহাকাব্যিক পটভূমিতে লেখা। তবে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে রোমান্টিকতার ছোঁয়া। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলি সমালোচকদের দৃষ্টি যতখানি আকর্ষণ করেছে, 'অরণ্য-বহ্নি' ততখানি পারেনি। আলোচনার স্বল্প ছিঁটেফোঁটা জুটলেও অন্ধকারের গাঢ় নিকষ কালো আঁধার উপন্যাসটির ভাগ্যাকাশে নতুন ঘটনা নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসটি সম্পর্কে 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে নিজেই বলেছেন, "আমার আরও একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অরণ্য-বহ্নি'। ১৮৫৫। ৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। এর ভৌগোলিক পটভূমি সংকীর্ণ। এর পতন অভ্যুদয়ের সনাতন লীলায় একটি অংশ সাম্প্রদায়িক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত কালের সেই আর্য অনার্য সংঘাতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে এবং তারই মধ্যে ভাবী কালের একটি প্রচণ্ডতর সংঘাতের সম্ভাবনাকে যেন অনুমান করা যায়। যার ভিত্তি আছে ও নাই-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১]

'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের কাহিনির সময়কাল সাঁওতাল বিদ্রোহের সমকালীন। উপন্যাসের শুরুতে প্রস্তাবনা অংশেই লেখক গল্প বলার ছলে, তিনি কেমনভাবে এই উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এবং কেমনভাবে বৃদ্ধ প্রতিমার কারিগর নয়ন পালের সন্ধান পেলেন,– তা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি আমাদের উপস্থিত করেছেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে। তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা একটিই প্রদেশ ছিল। আর এই প্রদেশে হুকুমত চলতো বিট্রিশ ও এদেশীয় ধনী উচ্চবর্গদের। উপন্যাসটি পাঠে আমাদের চৈতন্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যতখানি ভয়াবহ ছিল, ততখানি দেশীয় উচ্চবর্গের হাতে সাধারণ খেটে খাওয়া অধিবাসীদের শোষণ, নিপীড়ন, আক্রমণ ও হিংস্রতাও চরম আকার লাভ করেছিল। এরূপ অবস্থায় অসহায় নিম্নবর্গের ক্রন্দন করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে প্রতিরোধ ছাড়া উপায় থাকে না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ক্ষোভ জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। সাঁওতালদের আদিমতা ও বন্যতা প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিদ্রোহের মাধ্যমে। দীর্ঘ সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ হল এই সাঁওতাল বিদ্রোহ। তারই সচল সবাক চালচিত্র উঠে এসেছে 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক সুবোধ দেবসেনের 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ' গ্রন্থে 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাস প্রসঙ্গে করা মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণে আসে, " তথাকথিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠির ইতিহাস, সমাজ-জীবন নিয়ে রচিত 'অরণ্য-বহ্নি' (১৯৬৬ খ্রিঃ) তারাশঙ্করের পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে চিহ্নিত। নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক দলিলও বটে।"[২] অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক আশ্রয়ে কাহিনির প্রয়োজনেই শুধু নয়, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং তাদের সমাজ-জীবনের গুরুত্বটিও সমানভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসজুড়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের পূর্বে তাঁর অন্য আরেকটি উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) তে সাঁওতালদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সাঁওতালদের প্রতি তিনি যে সহানুভূতিশীল, তা স্বাধীনতা পূর্ব সময়েই প্রকাশ্য। "সাঁওতালদের নতুন বসতিস্থল কালিন্দীর চরকে কেন্দ্র করে দুই সামন্ত-জমিদারের বিরোধ এবং এই বিরোধিতার সুযোগে উঠতি ধনিক কারখানা-মালিকের সুকৌশলে চরের স্বত্ব অধিগ্রহণ– এই দুই বৈরী স্রোতধারার প্লাবনে ঋণভার আনত বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের উন্মীলিত হয়ে যাওয়ার কাহিনীই কালিন্দী-র মর্মকথা।"[৩] আরেক দিকে 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মূল সূত্রটি গাঁথা রয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনির ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে একত্রে মহাকাব্যিক পটভূমিতে অরণ্য অধিবাসী সাঁওতালদের দ্রোহ চেতনাকে স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে। 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসীদের কথা বিস্তারিতভাবে জানার আগে আরেক পশলা ইতিহাস আমাদের জানা দরকার।

ইতিহাসের দিকে নিবিড়ভাবে নজর ঘোরালে আমরা জানতে পারি, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে সাঁওতালদের আরো একটি যুদ্ধ হয়েছিল। আর সেই যুদ্ধেও সভ্যতার আলো চ্যুত

অরণ্যবাসী সাঁওতালরা পরাজিত হয়েছিল ইংরেজদের কাছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেন ব্রুক ও তার দলের সঙ্গে অরণ্যানীর সাঁওতালদের মধ্যে সে যুদ্ধ হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সে বছরেরই ডিসেম্বর মাসে ইংরেজরা মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। দেওয়ানি লাভের পর রাজমহল এলাকায় তারা প্রায় চল্লিশ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি করে। এ অবস্থায় ক্লিভল্যাণ্ড রাজমহলের সুপারেনটেন্ডেন্ট পদে আসীন হলে তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে 'দামিন-ই-কোহ্' নামে একটি উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং কিছুটা সফলও হন। তবে ছলনার কুহক সরে গেলে পরিষ্কার হয় রক্ত চক্ষু। আর তখনই আদিবাসীদের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। স্বাধীন জাতি সাঁওতাল। তারা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার জমি-অরণ্যের বাবদ খাজনা দিতে অস্বীকার করে। শুরু হয় ব্রিটিশদের শোষণ। এ অবস্থায় ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিলকা মুর্মু গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় তীব্র আঘাত হানেন একের পর এক ব্রিটিশদের উপর। ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের মৃত্যু হলে ব্রিটিশরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমনে নামেন। তিলকা মুর্মুকে ব্রিটিশ সেনারা হত্যা করবার পর বিদ্রোহ কিছুটা শান্ত হয়। তারপর ভাগলপুর ছেড়ে নতুন এলাকার পথে পা বাড়ায় সাঁওতালরা। তিলকা মুর্মুদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও স্বজাতির মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে আজও। এর পরবর্তীতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে সাঁওতালদের দু-একটি বিদ্রোহ হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন সেগুলির গুরুত্ব ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। এরপর ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের পেছনে ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের পাশাপাশি আরও দুটি কারণ ছিল। প্রথমটি হল, বলপূর্বক নীল চাষ আর দ্বিতীয়টি হল, মহাজনের চড়া সুদের দরুন পারিবারিক সূত্রে ঋণ বয়ে বেড়ানোর দাসত্ব। আমাদের আলোচ্য 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসে বলপূর্বক নীল চাষের প্রসঙ্গ তেমন জোরালোভাবে উপস্থিত না হলেও এ দেশীয় দিকু বা হিন্দু মহাজনদের চড়া সুদের কাছে বারংবার শোষিত হয়েছে সাঁওতালরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই।

ঐতিহাসিক হান্টার সাহেবের উক্তি এবং সংবাদ প্রভাকরের রিপোর্টের সাহায্যে উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়া প্রদানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন। সাঁওতাল আদিবাসীদের জীবন যাপন, বস্ত্র পরিধান, খাদ্যাভাস, প্রেম, ধর্মবিশ্বাস, আতিথেয়তা, সরল জীবন যাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গকে হাজির করেছেন ঔপন্যাসিক। 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল বাগনাডিহি গ্রাম। এই গ্রামেই দলবদ্ধভাবে সাঁওতালরা বসবাস করত। উঁচু জায়গা দেখে তাঁরা নিজেদের গ্রাম গড়ে তোলে। তাঁদের অধিকাংশ বাড়ি-ঘরের চালাগুলো খড়ের ছাউনি দেওয়া। দেওয়ালগুলো মাটি দিয়ে গড়া। দাওয়া এবং আঙিনাগুলো মাটির। আঙিনায় সুনিপুণ শিল্পীর হাতের স্পর্শ ছোঁয়া। নিকানো উঠান আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমস্ত বাড়ি ও তার চারপাশ দেখেই সাঁওতাল ঘরগুলো চেনা যায়। আর প্রত্যেকটি ঘরের সামনে কিছুটা পতিত খোলা জমি থাকবে। এই জমিতে পুরুষেরা হাল চালাবে, জনার লাগাবে, জোয়ার লাগাবে।

বসবাস করার পদ্ধতির পাশাপাশি সাঁওতালদের পোশাকের বিষয়েও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সাধারণত, পুরুষেরা একফালি বস্ত্র গায়েই কাটিয়ে দেয় তাদের জীবন। তবে সিধু কানু শুভোবাবু হয়ে উপস্থিত হওয়ার আগে স্নান করে নতুন কাপড় পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তাতে ময়ূরের পালক গুঁজে রূপাদস্তা ও পুঁতির বালা ও বুকে মোটা চাদর পৈতের মতো বেড়া দিয়ে বেঁধে এসেছিল। অন্যদিকে সাঁওতাল রমণীরা সাজগোজ করতে পছন্দ করে। রূপার অলংকারের পাশাপাশি ফুল ব্যবহার করে তারা সাজবার জন্য। চুল আঁচড়ানোরও বিশেষ পদ্ধতির কথা জানা যায়। সিঁথি কাটে না তারা; সমান করে টেনে চুল পাকিয়ে খোপা বাঁধে। খোঁপায় গাঁথে থোকা থোকা লাল ও হলুদ ফুল। আর "পরনে দুপ্রস্ত সাঁওতালী তাঁতে বোনা মোটা সুতোর কাপড়; রঙিন, একপ্রস্ত কোমর থেকে নিচের দিকে, অপর প্রস্তটাকে

কোমরে একপ্রান্তে গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমর আঁটসাট করে জড়িয়ে গোঁজে। গলায় ওই ওদের হীরে মানিক রঙিন পুঁতির মালা।"[৪]

'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে সাঁওতাল আদিবাসীদের খাদ্যাভাসের কথা। তাঁদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং শাকসবজি। এছাড়াও কাঁকড়া, শূকর, মুরগি, খরগোশ, কাঠবিড়ালির মাংস ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। পাটশাক বিশেষ পছন্দের খাবার, হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পাখির ডিমও তাঁদের খাদ্য তালিকাভুক্ত। এছাড়াও কচ্ছপের মাংসও রয়েছে। অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণে দাকা, সিন আর হাঁড়িয়ার উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দাকার অর্থ ভাত, সিন অর্থে মুরগি এবং হাড়িয়া অর্থে পাঁচুই মদ। পাঁচুই মদ সাঁওতালদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাঁওতালদের সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্লান্তির দাওয়ায় পাঁচুই মদ। কঠোর হাড় ভাঙা খাটুনির পর সাঁওতালরা সন্ধ্যেবেলা ক্লান্তি ঘোচানোর জন্য পরিবারের লোকজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দু-এক হাঁড়ি হাড়িয়া ওদের আমোদের অংশ; উৎসব, আনন্দানুষ্ঠানের উপকরণ। ধামসা, মাদল আর সমবেত নাচ গানের উদ্দাম কলতানের সঙ্গে পাল্লা দেয় হাড়িয়া। দারিদ্রের যন্ত্রণা, নিপীড়ন, শোষণ সমস্ত কিছুকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার জন্য হাড়িয়ায় মসগুলহয়ে থাকে তারা। হতাশার তীব্র ঝোঁককে সরিয়ে দেয়, রাতের কালো আঁধারে ভুলে থাকে জাতির যন্ত্রণা এই হাড়িয়ার জন্যই। 'অরণ্য-বহ্নি'তে সাঁওতালদের এই অভ্যাস ও চিরাচরিত জীবন যাপনের দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

নব্বই বছরের বৃদ্ধ প্রতিমার কারিগর নয়ন পালের পট বর্ণনার সুত্র ধরে উপন্যাসের কাহিনি কায়া লাভ করেছে। আর এই কায়াতে প্রাণ দিয়েছে প্রেমের চেতনা। সাঁওতালদের প্রেম অভিনব রকমের। প্রেমের জন্য তারা যেমন জান দিতে পারে তেমন নিতেও জানে। লাল মাঝিকে ভালোবেসে পালিয়ে গেছে মানকী। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের চাইতে বেছে নিয়েছে সংগ্রামের জীবন। অন্যদিকে ফুল ও টুশকীকে বিয়ে করেছে সিধু-কানু। কিন্তু তারা মন দিয়েছিল রুকনী ও টুকনীকে। কানু একটি সময়ে এসে শেষ পর্যন্ত টুকনীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। নাম দিয়েছে তার সঙ্গে টুকনীর সম্পর্কটিকে। কানু মারা গেলে মেনে নেয়নি টুকনীকে সমাজ। বাধ্য হয়ে পালিয়ে গিয়ে টুকনীকে আবার হতে হয়েছে খ্রিস্টান। অন্যদিকে সিধু বহুবার রুকনীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। কিন্তু রুকনী বার বার এড়িয়েছে সে প্রসঙ্গ কোনো না কোনো ভাবে। যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসার কথায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছে রুকনী। কিন্তু ততদিন সে পুরুষ বেশে সিধুর ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকতে চেয়েছে। লড়াই করে গেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। অন্ধবিশ্বাস ও কৌশলের অভাবে যুদ্ধে হার হয় সাঁওতালদের। এমতাবস্থায় সিধুর ফাঁসি হলে পর দুঃখ শোকে চেতন অচেতনের কোনো এক নাম না পর্যায়ে গিয়ে কাপড়ে আগুন লাগলেও তার শুভোবাবুকে খুঁজেছে রুকনী। এক অমর প্রেমের গল্প কথা হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

সাঁওতালরা এদেশের অন্যতম প্রাচীন একটি জাতি। তাদের ধর্মীয় সংস্কারবোধ এবং আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ থেকে তাদের সরলতা প্রকাশ পায়। 'জহর সর্ণা' অর্থাৎ দেবতার স্থানের বিবরণ লক্ষিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে বহুবার। বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেছে জহর সর্ণা। মারাং বোঙ্গা হলেন সাঁওতালদের প্রধান দেবতা। তার আদেশকে শিরোধার্য করে চলে সাঁওতালরা। গাছের নিচে পূজা করে সাঁওতালরা মারাং বোঙ্গার। তার নির্দেশেই শুভোবাবু হয়েছে সিধু-কানু। শুভোবাবুর অর্থ রাজা। হুল অর্থাৎ বিদ্রোহ করার আদেশও তারই দেওয়া। ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের বাল্য বিধবা কন্যা ভৈরবী শাম্যময়ী দেবীও বরণ করেছেন সিধু-কানুকে। বিদ্যুৎ এসে পড়েছে শাল গাছের মাথায়। তারপর তার গা বেয়ে বড় পাথরকে দুভাগ করেছে। সিধু মনে করেছে এটি মারাং বোঙ্গার আগামী কোনো ইশারা। তারপর বিদ্রোহের সময় দেবতার আশীর্বাদে গুলি জল হয়ে যাবে বলে ধারনা করেছে সাঁওতালরা। অর্থাৎ সংস্কারবোধের কতকটা যে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সেটা না বুঝতে পারলেও সরল সাঁওতাল জাতির প্রাণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আছে সংস্কারবোধ।

হিন্দু সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা বর্তমান; ছোয়াছুঁয়ির বাছ-বিচার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে জায়গায় সাঁওতালদের মধ্যে সেরকম বাছ-বিচারের কথা পাওয়া যায় না। বরং হিন্দু সমাজে যারা অচ্ছুৎ, দলিত তারা সাঁওতালদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সাহায্য করেছে সাঁওতাল বিদ্রোহে। লোহার, কামার, ডোম সহ নিম্ন জাতির মানুষেরা নানা সময় সাঁওতালদের জীবনে হালে পানি আনার মতো কাজ করেছে। উচ্চবিত্ত দিকু বা হিন্দু মহাজনদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে সাঁওতালরা বহুবার। উল্টো দিকে উপকৃত হয়েছে হিন্দু নিম্ন জাতির মানুষদের হাতে। কেনারাম ভকত ও মহেন্দর ভকতের কাছে ধার করে সারা জীবনেও পার পায় না দরিদ্র সাঁওতালরা। তার উপরি আবার মহেশ দারোগার হাতে নির্যাতিত হয়েছে তারা। এ অবস্থায় লিটাপাড়ার পোটেন্ট বা পাল্টিন সাহেব সাঁওতালদের প্রতি দরদী মনোভাব রাখলেও উপরিমহলের বাকি ইংরেজ সাহেবরা সাঁওতালদের শোষণ করার পক্ষেই দাঁড়িয়েছে। রেলের রাস্তাবন্দিতে ইংরেজ কনট্রাক্টর ও কর্মচারীদের হাতে ধর্ষিত হয় সাঁওতাল রমণীরা,– একথা জানবার পরেও ইংরেজরা কোনো পদক্ষেপ নেয় না। উল্টে কমিশনার মি: সাদারল্যাণ্ড ব্ল্যাক নিগার সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন, "ওরা মরবার জন্যেই জন্মেছে এবং অন্যের জন্য খেটে মরবে।"[৫] অর্থাৎ, সাঁওতালদের জীবনের যেন কোনো মূল্যই নেই অধুনা সিভিলাইজড সোসাইটিতে। ভীম মাঝির বারো শালি ধান এক বছরে সুদে আসলে দাঁড়ায় একশো শালি। সেটা মেটানোর পরও মেলেনি রেহায়। মহাজন কেনারাম ভকত খাতা খোলে। তিন বছর আগে ধার নেওয়া আধ শালি ধান বর্তমানে আবার বেড়ে হয়েছে একশো শালি। ভীম দিতে না চাইলে চার বিঘা জমি চায় ভকত। তাতেও রাজি না হলে মরাইতে হাত দিতে উদ্ধত হয় কেনারাম, ভীমের হুংকারে খানিক ক্ষান্ত হলেও কেনারাম কাঁড়া গোরু কোরক করতে এগিয়ে আসে। শেষমেশ ভীম কোনোমতে ভাগিয়ে দেয় কেনারামকে। কেনারাম নালিশ জানায় দারোগাকে। জেল হয় ভীম মাঝির। অন্যদিকে মানকী, রুকনী, টুকনীকে ইংরেজরা তুলে নিয়ে গেছে নিজেদের আমোদের জন্য। একে সাঁওতাল তার ওপর আবার নারী– কতটুকুই বা তাদের চাওয়া পাওয়ার কথা ভাবতে পারে ক্ষমতাবান ইংরেজ ও মহাজনেরা, তা সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেই অনুভব করতে সক্ষম।

সাঁওতাল আদিবাসী সমাজের মধ্যে আরেকটি প্রথা প্রচলিত, বংশানুক্রমে রাজা ব্যাটার রাজা হওয়ার প্রথা। উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে থেকেই আমরা জানতে পারি সিধু-কানুর বাবা চুনার মুর্মুর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন রাজা। ক্ষমতা কখনই চিরস্থায়ী হয় না। পরিবর্তনই তার নিয়ম। কাজেই এক কালে প্রভাব প্রতিপত্তিতে রাজা চুনার মুর্মুর পূর্বপুরুষদের মতো অবস্থাটা আজ আর নেই। ক্ষমতাও গেছে হারিয়ে। ভাগ্য বিড়ম্বনায় শেষাবধি বাগনাডিহিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছেন তিনি। পাশের গ্রামের লোকজনেরা এখনও তাকে সম্মান করে, কখনও কখনও প্রয়োজনে পরামর্শ নিতেও আসে লোকজন। ক্ষমতার মৌরসী পাট্টা হারিয়ে গেলেও আজও বিবাদের মীমাংসায় চুনার মুর্মুর কথাই শেষ কথা। শুধুমাত্র রাজার ব্যাটাই রাজা হবে চিরকাল তা নয়, পরগনায়েৎ কিম্বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতেও ছিল বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার প্রথা। ব্রিটিশ পরিচালিত আইন আদালতের সঙ্গে তাদের পরিচয় কম। তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান করত মূলত পঞ্চায়েত এবং পরগনায়েতের মাধ্যমে।

'অরণ্য-বহ্নি'তে দাস কেনা বেচার মতো প্রাচীন প্রথাটি হাজির হয়েছে নিজস্ব ঢঙে। মাত্র দশ টাকা ধার করেছে যে সাঁওতাল তার আর মুক্তি নেই। সারাজীবন বেগার খাটার পরেও রেহায় মেলেনি ভকতদের দাসত্ব থেকে। এছাড়া সাঁওতাল আদিবাসীদের আতিথেয়তায় সপ্রতিভতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। সহজ সরল হৃদয়বান সাঁওতালরা অতিথিপরায়ণ। সিধু-কানু বোন মানকীর ঘরে গেলে গান বাজনার আসর বসেছে। মাদল, বাঁশি ইত্যাদির কলতানে মুখরিত হয়েছে লাল-মানকীর সংসার। সঙ্গী হয়েছে বিশু মাঝির যমজ মেয়ে রুকনী ও টুকনী। মাদল বাজিয়ে গান গেয়ে অতিথিদের স্বাগত জানানো সাঁওতাল আদিবাসীদের সংস্কৃতির একটি অংশ।

৬.০ উপসংহার (Conclusion)

রাজনীতি পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। বৃহৎ সংস্কৃতি ক্ষুদ্র সংস্কৃতিদের গ্রাস করতে চায়। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের সর্বত্রই সংস্কৃতির রূপান্তরটি লক্ষ করা যায়। সাঁওতালদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলতে চেয়েছে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। মারাং বোঙ্গার বদলে ক্রশের গুরুত্ব শেখাতে চেয়েছে খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা। লোভ দেখিয়েছে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেবার। লোভে পা ফেলে ধর্ম বদলে ফেলেছে অনেক সাঁওতাল। ধর্মের সংকীর্ণতাকে বয়ে নিয়ে চলেছে ধর্মের উদারতার নামে। রঙিন পৃথিবীর বুকে এক একটা বেড়া দিয়ে মানুষ তার সীমানাকে ছোটো করেছে। কিন্তু তারপরও বদল ঘটেনি অসহায়তার। মানকী-রুকনী-টুকনীকে অপহৃত এবং অত্যাচারিত হতে হয়েছে রেলের রাস্তাবন্দীতে নিযুক্ত সাহেবদের হাতে। দুর্নীতিগ্রস্ত এ দেশীয় দারোগাও ফুর্তির জন্য বেছে নেয় সরল সাঁওতাল রমণীদের। দুঃখের শেষ থাকে না। শেষমেশ অস্ত্র হয় একমাত্র বিদ্রোহ। মারাং বোঙ্গার ইশারা মনে করে লড়াই করতে শুরু করে প্রায় কুড়ি হাজার সাঁওতাল। দেবতার বরে গুলি জল হবে ভেবে লড়াই করতে নামে তারা। কিন্তু অলৌকিক চমৎকারিত্বের বদলে সাধারণ ঘটনা ঘটে গুলি বর্ষণে। গুলি লাগে কানুর কপালে। শেষ হয় কানুর জীবন। ধরা পড়ে সিধু। মহুয়া গাছের ডালে ফাঁসি হয়। উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন, "...যজ্ঞের আগুনে রুকনী পুড়ে মরে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সিধু আজও মুক্তি পায়নি, ইতিহাস ওকে মুক্তি দেয় নি। আজও সে বুকে হাত দিয়ে ছায়ায় মিশে সেই ফাঁসি-দেওয়া মহুয়া গাছটায় ঠেস দিয়ে ভাবে!"[৬]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বলিষ্ঠ কথাকার। সাঁওতালদের অসীম সম্ভাবনার প্রকাশ হতে পারতো উপন্যাসটি। কিন্তু শেষ অবধি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে সাঁওতালদের স্বপ্নকে খুন হতে হয়েছে। সিধু-কানু সহ সাঁওতালদের হেরে যেতে হয়েছে হিন্দু মহাজন ও ইংরেজদের মিলিত বলের কাছে। আদিম অধিবাসী সাঁওতালদের নিয়ে চর্চা সাবঅল্টার্ন স্টাডিসের চর্চার সঙ্গে নতুনভাবে হচ্ছে অধুনা লেখক গবেষকদের হাতে। কিন্তু তাতে প্রাইমারি এভিডেন্সরূপে গুরুত্ব সহকারে আজও ব্যবহৃত হয় হান্টার সাহেবের উক্তি অথবা সংবাদ প্রভাকরের পাতা। আর তার তত্ত্বের বিশ্লেষণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি'ও গুরুত্বপূর্ণ একটি জীবন্ত জীবাশ্ম। আদিবাসী কথা তার প্রধান শেকড়।

৭.০ তথ্যসূত্র (References)

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ). *তারাশঙ্কর রচনাবলী একবিংশ খণ্ড.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা. পৃ. ৩৬১

২. দেবসেন, সুবোধ. (২০১০). *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ.* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৭২

৩. চৌধুরী, ভীষ্মদেব. (১৯৯৮). *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি.* বাংলা একাডেমী. ঢাকা. পৃ. ২৬৯

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ). *তারাশঙ্কর রচনাবলী অষ্টাদশ খণ্ড.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা. পৃ. ৩২৫

৫. তদেব, পৃ. ৩৮৫

৬. তদেব, পৃ. ৪৫০

৮.০ উল্লেখপঞ্জি (Bibliography)

চৌধুরী, ভীষ্মদেব. (১৯৯৮). *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি.* বাংলা একাডেমী. ঢাকা.

দেবসেন, সুবোধ. (২০১০). *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ.* পুস্তক বিপণি, কলকাতা,

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ). *তারাশঙ্কর রচনাবলী অষ্টাদশ খণ্ড.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা.

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ). *তারাশঙ্কর রচনাবলী একবিংশ খণ্ড.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. কলকাতা.

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ. (১৯৬০). *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস.* পার্ল পাবলিশার্স. কলকাতা.